প্রি জাজমেন্ট

কপিল দেব

'দয়া করে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারি। দিঘা থেকে পুরীগামী ট্রেন নম্বর ২-২-৮-৮-৯, সমুদ্র কন্যা এক্সপ্রেস, কিছুক্ষণের মধ্যেই চার নম্বর প্ল্যাটফর্মে পৌঁছাবে।'

লাউডস্পিকারের ঘোষণাটা রাতের ব্যস্ততার মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। ভুবনেশ্বর স্টেশন রাতের বেলায় নিস্তব্ধ নয়, বরং একটা জমজমাট ভাব। একের পর এক ট্রেন আসছে, প্ল্যাটফর্মে যাত্রীদের ভিড়, মানুষজনের কোলাহল, আর ঘোষণার শব্দে মুখরিত। ভুবনেশ্বর থেকে পুরীর দূরত্ব অনেক হলেও, রাতের বাতাসে সামুদ্রিক লবণের হালকা ছোঁয়া পাওয়া যায়, যেন সমুদ্রের হাওয়া এখানে এসে মিশেছে। প্ল্যাটফর্মের মলিন হলুদ আলোতে সুমিত তার বাবা-মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে। তার পরনে হালকা নীল শার্ট, কলারে ঘামের দাগ, হাতে একটা ছোট ব্যাগ, যার জিপারে একটা পুরনো চাবির রিং ঝুলছে। তার বোন পাশে বসে, কানে ইয়ারফোন গোঁজা, মোবাইলে গান শুনছে। তার পরনে ফিকে গোলাপি কুর্তি, চুলে একটা সাধারণ ব্যান্ড। ঘোষণার পনেরো মিনিট পর ট্রেন আসবে, তাই তারা তৈরি হচ্ছে। সুমিত তার ব্যাগটা কাঁধে তুলে নিল, বাবা-মা তাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছেন, আর তার বোন ইয়ারফোন খুলে প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকাল।

সুমিত প্ল্যাটফর্মের ব্যস্ততার মাঝে চোখ বোলাতে গিয়ে এক কোণে নজর পড়ল। একটা ঝাপসা আলোর নিচে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে। তার চুলে ধুলো জমে আছে, কাঁধে একটা পুরনো ঝোলা, যার স্ট্র্যাপটা কিছুটা ক্ষয়ে গেছে। পরনে একটা সাধারণ ধূসর শার্ট, কলারটা একটু উঁচু হয়ে আছে, প্যান্টের একপাশে হালকা দাগ। পায়ে জীর্ণ স্যান্ডেল, যেন অনেক পথ ঘুরে এসেছে। তার দৃষ্টি অস্থির, বারবার চারপাশে তাকাচ্ছে, যেন কিছু খুঁজছে বা কাউকে এড়াতে চাইছে। সুমিতের মনে হয়, এই ছেলেটির মধ্যে কিছু গোপন উদ্দেশ্য আছে।

'দিদি, ওই ছেলেটাকে দেখ, 'সুমিত ফিসফিস করে।' ও নিশ্চয়ই চোর। দেখ, ওর হাবভাব দেখালেই বুঝা যায়। ও কিছু একটা প্ল্যান করছে।' তার বোন ইয়ারফোন খুলে হাসে, 'তোর শুরু হয়ে গেল বুঝি? থাম তো!' কিন্তু সুমিতের মন অন্য কথা বলছে। তার মাথায় একটা অদ্ভুত ক্ষমতা কাজ করছে মানুষের হাবভাব, চোখের দৃষ্টি, চলাফেরা দেখে সে যেন তাদের মনের উদ্দেশ্য পড়ে ফেলতে পারে। এই ছেলেটির অস্থিরতা, চোখের চোরা দৃষ্টি সব মিলিয়ে সুমিত নিশ্চিত, এ একজন চোর।

ট্রেন এসে পড়ে। সুমিত, তার বোন আর বাবা-মা কামরায় ওঠে। আশ্চর্যের বিষয়, ওই ছেলেটিও তাদের কামরায় উঠে। সুমিতের বুক ধক করে ওঠে। 'দেখলি, আমি ঠিক বলেছিলাম,' সে ফিসফিস করে। কিছুক্ষণ পর অন্য কামরা থেকে হইচই শুরু হয়। সুমিত কৌতূহলী হয়ে উঠে যায়। একজন টিটি ছুটে আসছে, হাতে মোবাইল। সুমিত জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে, স্যার?' টিটি বিরক্ত মুখে বলে, 'একটা চোর ধরা পড়েছে। ব্যাগ চুরি করেছিল, কিন্তু পালাতে পারেনি।' সুমিতের কৌতূহলী চোখ দেখে টিটি মোবাইলে একটা ছবি দেখায়। সুমিতের মুখে হাসি ফোটে। তার ধারণা ঠিক। আবারও।

কালীপুর গ্রামের ধুলোমাখা রাস্তার এক কোণে শম্ভুনাথ মুখার্জির ক্লিনিক। টিনের চালার নিচে একটা পুরনো সাইনবোর্ড ঝুলছে, যেখানে লেখা: শম্ভুনাথ মুখার্জি, আর এম পি এবং আরও অনেক কিছু। সাইনবোর্ডের রং ফিকে, অক্ষরগুলো মলিন। সুমিত ক্লিনিকের বাইরে একটা কাঠের বেঞ্চে বসে আছে। তার পরনে সাদা শার্ট, কলারে ঘামের দাগ। হাতে একটা ফাইল, যার কোণে একটা ছোট্ট কালির দাগ। এটা তার

প্রথম চাকরি একটা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ। প্রতিদিন ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলতে হয়, ওষুধের প্রচার করতে হয়। প্রতিবারই তার বুক কাঁপে যদি ভুল হয়? যদি তার কথা কেউ না শোনে?

ক্লিনিকের সামনে একটা ছোট ফার্মেসি। কাউন্টারে বসে আছেন একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক। তার পরনে ফিকে নীল শার্ট, কাঁধে পাতলা গামছা। চোখে পুরনো ফ্রেমের চশমা, হাতে একটা ছোট টিভির রিমোট। টিভিতে একটা বাংলা গান বাজছে, কিন্তু তার চোখ ঝিমুনি। সুমিত উঠে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'ডাক্তারবাবু কখন আসবেন?' ভদ্রলোক মাথা নাড়েন, 'একটু দেরি আছে। বসুন।'

সুমিত ফিরে এসে বেঞ্চে বসে। তার মন অস্থির। সে ভাবছে, শম্ভুনাথ এলে কীভাবে কথা শুরু করবে। তার ফাইলে কোম্পানির ওষুধের তালিকা, কিন্তু সে জানে না কীভাবে আরএমপি-র মন জয় করবে। তার মাথায় ভয় যদি শম্ভুনাথ তার কথা না শোনেন? যদি তাকে বকেন? এই চাকরিটা তার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটা তার মনে পড়ে। সে মনে মনে ভাবছে, প্রথমে কোম্পানির নাম বলবে, তারপর ওষুধের গুণাগুণ। কিন্তু যদি শম্ভুনাথ ব্যস্ত থাকেন? যদি তাকে সময় না দেন?

একটা মোটরবাইকের শব্দে সুমিতের ধ্যান ভাঙে। একজন মানুষ বাইক থেকে নামলেন। তার পরনে সাদা-কালো প্রিন্টের শার্ট, শার্ট কোমরে গোঁজা নয়। প্যান্টটা ঢিলেঢালা, পায়ে সাধারণ কালো চটি, যার একটা ফিতে ছিঁড়ে গেছে। তার চুলে তেলের চকচকে ভাব, কিন্তু কপালে ঘামের ফোঁটা। কাঁধে একটা ছোট কালো ব্যাগ। সুমিত ভাবল, এ নিশ্চয়ই কোনো পেশেন্ট। মানুষটি সোজা চেম্বারের দিকে এগিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকলেন, 'এই, ভেতরে এসো।'

সুমিতের পাশ থেকে একটা মেয়ে উঠে দাঁড়াল। সুমিত এতক্ষণ খেয়ালই করেনি যে তার পাশে কেউ বসে ছিল। মেয়েটির বয়স বোধহয় ২৫-২৬, পরনে সবুজ সালোয়ার-কামিজ, কিন্তু কাপড়টা মলিন, কোণে একটা ছোট ছেঁড়া দাগ। তার চুলে একটা সাধারণ কালো ক্লিপ, মুখে একটা ক্লান্ত ভাব। হাতে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ, যার ভেতর থেকে একটা পুরনো তোয়ালের কোণ বেরিয়ে আছে। তার হাঁটার ধরনে অস্বাভাবিকতা বাঁ-পা একটু টেনে টেনে হাঁটছে, ডান পা যেন একটু বেঁকে যাচ্ছে, যেন প্রত্যেক পদক্ষেপে তার শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে হিমশিম খাচ্ছে। তার পায়ের চলন দেখে মনে হয় যেন কোনো পুরনো আঘাতের ফলে হাঁটতে গেলে একটা অদৃশ্য বাধা অতিক্রম করতে হচ্ছে, যার ফলে তার গতি ধীর এবং অসমতল। সে ধীরে ধীরে চেম্বারের দিকে এগিয়ে গেল, প্রত্যেক পদক্ষেপে তার শরীরের ভার একপাশে ঢলে পড়ছে, যেন সে নীরবে একটা অদৃশ্য যুদ্ধ লড়ছে। তার মুখে একটা নীরব কষ্টের ছায়া, চোখে একটা শান্ত ধৈর্য। সুমিতের মনে হলো, এই মেয়েটির জীবনে কী যেন একটা ভারী গল্প আছে।

একটা হাফপ্যান্ট পরা ছেলে হুট করে ক্লিনিকের সামনে এসে দাঁড়াল। তার বয়স বোধহয় ৩৫-৪০ এর মধ্যে, পরনে লাল-কালো চেক শার্ট, একটা হাতা গুটানো, আরেকটা খোলা। পায়ে চটি, চুলে ধুলো জমে আছে। তার হাতে একটা ছোট প্লাস্টিকের প্যাকেট, যার ভেতর কী যেন ঝনঝন করছে। সে ফার্মেসির ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে চোখে ইশারা করল একটা দ্রুত, গোপন ইশারা। ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, যেন কিছু বুঝে গেছেন। ছেলেটি সোজা চেম্বারে ঢুকে গেল।

সুমিতের মনে একটা খটকা লাগল। এই ইশারার মানে কী? তার মাথায় একটা ছবি তৈরি হতে শুরু করল। মেয়েটি, যে ধীরে ধীরে হাঁটছিল, তার শারীরিক অবস্থা। ছেলেটি, যে গোপনে ইশারা করল। আর শম্ভুনাথ, যিনি ডাক্তার নন, শুধু আর এম পি। এই ক্লিনিকে কিছু গোপন কাজ চলছে। হয়তো মেয়েটি

গর্ভবতী, আর এই ছেলে তার জন্য দায়ী। শম্ভুনাথ হয়তো অ্যাবরশনের কাজ করেন। সুমিতের মনে হলো, এই লোকের সঙ্গে কথা বলা সহজ হবে। সে তো ডাক্তারই নন! তার ভয় কেটে গেল। সে ভাবল, যদি শম্ভুনাথ এমন কাজ করতে পারেন, তাহলে তার কোম্পানির ওষুধ বিক্রি করানো কোনো বড় ব্যাপার নয়। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলাটা যতটুকু কষ্টকর, ভয়ের বিষয়, শম্ভুনাথের ক্ষেত্রে এখন আর বিষয়টি একই রইল না। শম্ভুনাথ যেন সুমিতের চোখে এখন আর-ছারটা মানুষের মত সাধারণ হয়ে উঠল।

কিছুক্ষণ পর ছেলেটি বেরিয়ে এসে ফার্মেসির ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করল, 'ওই ওষুধটা আছে?' তার কণ্ঠে তাড়াহুড়ো। ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, 'না, এখানে নেই। অন্য ফার্মেসিতে দেখো।' ছেলেটি বিরক্ত মুখে বেরিয়ে গেল, তার চটির শব্দ ধুলো উড়িয়ে। সুমিতের ধারণা আরও পোক্ত হলো। ছেলেটি নিশ্চয়ই অ্যাবরশনের পরের ওষুধ খুঁজছে। এই ক্লিনিকে কিছু একটা গোপন কাজ চলছে। সুমিত মনে মনে ভাবল যদি শুধুনাথ তাকে সাহায্য না করে, তাহলে শুধুনা থকে সুমিত অন্যভাবে বুঝিয়ে দেবে যে, সে সব কিছু বুঝে গেছে যে এই ক্লিনিকে কি কাজ হয়, এবং তাকে সাহায্য না করবার পরিণামটাও ভাল হবে নয়।।
শম্ভুনাথ চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলেন। তার শার্টের হাতা গুটানো, কপালে ঘাম। তিনি ফার্মেসির ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আজ ব্যস্ত আছি। কেউ প্রেসার চেক করতে এলে তুমি দেখে নিও। আমি একটু বেরোব।' ভদ্রলোক সুমিতের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'উনি অনেকক্ষণ ধরে আপনার জন্য বসে আছেন।' শম্ভুনাথ সুমিতের দিকে তাকালেন, চোখে অধৈর্য ভাব। 'কী চাই?'

সুমিত তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল, ফাইলটা হাতে ধরে বলল, 'স্যার, আমি একটা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি থেকে এসেছি। আপনার সঙ্গে অল্প কথা বলতে চাই। চেম্বারে বসে বলতে পারি?' শম্ভুনাথের কপালে ভাঁজ পড়ল। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, চোখে একটা অস্থিরতা। সুমিতের মনে হলো, শম্ভুনাথ চিন্তায় পড়ে গেছেন। হয়তো তিনি ভাবছেন, চেম্বারে মেয়েটি আছে, এখন কীভাবে সুমিতকে ভেতরে নিয়ে যাবেন? এইমাত্র অ্যাবরশনের কাজ শেষ হল, আর তিনি চান না কেউ তা দেখুক।

সুমিতের মাথায় আরও চিন্তা ঘুরতে শুরু করল। যদি শম্ভুনাথ তাকে চেম্বারে না নিয়ে যান, তাহলে কোথায় কথা বলবে? বাইরে, এই ধুলোমাখা বেঞ্চে? না, তা হবে না। তার কোম্পানির ওষুধের তালিকা, বিক্রয়ের পরিকল্পনা এসব সবার সামনে বলা যায় না। ক্লিনিকের পাশে একটা ছোট চায়ের দোকান আছে, কিন্তু সেখানে বসে কথা বলা কি ঠিক হবে? নাকি কাছাকাছি কোনো গাছতলায়? সুমিতের মনে হলো, শম্ভুনাথ তাকে আজ কথা বলার সুযোগ দেবেন না। হয়তো বলবেন, 'কাল এসো।' তার বুকটা ধক করে উঠল। এই চাকরিটা তার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ! যদি আজ কথা না হয়, তার বস কী ভাববেন? সে কি আরেকটা সুযোগ পাবে? শম্ভুনাথ কিছুক্ষণ ভাবলেন, তারপর হঠাৎ বললেন, 'ঠিক আছে, ভেতরে আসুন।' সুমিতের মাথায় যেন বাজ পড়ল। ভেতরে? এখন? মেয়েটি তো ভেতরে আছে। হয়তো চেম্বারে আরেকটা কক্ষ আছে, যেখানে মেয়েটি শুয়ে আছে। নয়তো শম্ভুনাথ এতটা নির্লজ্জ যে সবকিছু যেনে শুনে সুমিতকে ভেতরে ডাকছেন। সুমিতের মন অস্থির হয়ে উঠল। সে কী দেখতে যাচ্ছে? তার হাতে ফাইলটা শক্ত হয়ে আঁকড়ে রইল। সে ভাবল, হয়তো এই ক্লিনিকে এমন কিছু হয়, যা কেউ জানে না। তার বুকের ধুকপুকানি বাড়ল। সে ধীরে ধীরে চেম্বারের দরজার দিকে এগোল।

দরজাটা পুরনো কাঠের, রং খসে গেছে, হাতলে মরচে। সুমিত দরজা খুলতেই একটা ঠান্ডা বাতাস তার মুখে লাগল। চেম্বারটা ছোট, দেয়ালে ফাটল, একটা পুরনো সিলিং ফ্যান ধীরে ধীরে ঘুরছে। বাঁদিকে

একটা অদ্ভুত চেয়ার। চেয়ারটা ধাতব, পুরনো চামড়ার কভার ছিঁড়ে গেছে। মাথার কাছে একটা কুশন, দুপাশে হাতল, পায়ের কাছে একটা লিভার। চেয়ারের পাশে একটা ছোট ট্রে, তার ওপর ধাতব যন্ত্রপাতি ছোট ছোট প্লায়ার, একটা অদ্ভুত ক্লিপ। মাথার ওপর একটা বড় বাতি, যার আলো মেয়েটির মুখে পড়ছে।

মেয়েটি চেয়ারে শুয়ে আছে। প্রথমে সুমিত লজ্জায় ওদিকে তাকাল না, কিন্তু পরবর্তী সময়ে সে ধীরে ধীরে তার দিকে তাকাল এবং দেখতে পেল যে মেয়েটির মুখে একটা ধাতব ক্লিপ, যেন মুখটা খোলা রাখার জন্য। তার চোখে একটা কষ্টের ছায়া, হাত দুটো চেয়ারের হাতলে শক্ত হয়ে আঁকড়ে আছে। তার সালোয়ারের কোণে মলিন দাগ, প্লাস্টিকের ব্যাগটা চেয়ারের পাশে পড়ে আছে। তার মুখ ফ্যাকাশে, ঠোঁটে একটা নীরব যন্ত্রণা।

সুমিতের মাথায় এখনও অ্যাবরশনের ধারণা ঘুরছে, যতক্ষণ না অবদি তার চোখ গিয়ে পড়ল চেয়ারের পাশে রাখা একটি ট্রেতে। সেখানে একটা রক্তমাখা দাঁত। তার মাথায় হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল। দাঁত? বিষয়টি দেখে সুমিত যেন কিছুক্ষনের জন্য থেমে গেল। তার মনে পরে গেল ক্লিনিকে ঢোকার সময় সাইনবোর্ডে ডাক্তারের নামের পাশে আরও অনেক কিছু সঙ্গে 'দন্ত চিকিৎসক' লেখাটাও ছিল।
সুমিতের মুখ লাল হয়ে গেল। মেয়েটি গর্ভবতী নয়। সে এখানে দাঁত ফেলতে এসেছে। হাফপ্যান্ট পরা ছেলেটি হয়তো তার ভাই বা কেউ, ব্যথার ওষুধ খুঁজতে গিয়েছিল। এই চেয়ারটা একটা ডেন্টিস্টের চেয়ার। শম্ভুনাথ কোনো গোপন কাজ করছেন না। সুমিত মেয়েটার মুখের দিকে তাকাল, মেয়েটির চোখ বোজা। তার মলিন কাপড়, তার নীরব ধৈর্য সব মিলিয়ে যেন একটা জীবনের গল্প বলছে। সুমিত লজ্জায় মেয়েতির দিকে আর তাকাতে পারল না। মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে সুমিত শম্ভুনাথের টেবিলের সামনে থাকা চেয়ারে গিয়ে বসলো। সে কি করে কথা শুরু করবে সব যেন তার মধ্যে গুল পাকিয়ে গেল।

শম্ভুনাথ সুমিতের কথা শুনলেন, কিন্তু তার মুখে অধৈর্য ভাব। 'দেখি, পরে বলব', বলে তিনি চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেলেন। সুমিত বাইরে এসে দাঁড়াল। তার মন ভারী। মেয়েটির মুখটা তার চোখে ভাসছে তার ক্লান্ত চাহনি, তার শরীরের অসমতল গতি যেন একটা অদৃশ্য যুদ্ধের গল্প বলছে। সুমিত ভুল করেছে। তার ক্ষমতা, যাকে সে এত গর্ব করে, তাকে ভুল পথে নিয়ে গেছে। কালীপুরের ধুলোমাখা রাস্তায় দাঁড়িয়ে সুমিত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মানুষকে বোঝার জন্য শুধু চোখের দৃষ্টি যথেষ্ট নয়। তার আরও শিখতে হবে। মানুষকে নিয়ে Pre Judgement করবার আগে তাকে এখন শতবার ভেবে নিতে হবে।